মহাশ্বেতা নিবেদিতা

সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

প্রধান সম্পাদক

প্রফেসর ড. মমতা চৌধুরী রায়

অধ্যক্ষা, বেথুন মহাবিদ্যালয়, কলকাতা

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

সমতা বিশ্বাস

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

বেথুন মহাবিদ্যালয়

২০১৭

প্রকাশকাল

মার্চ, ২০১৭

সম্পাদক

ড. মমতা চৌধুরী রায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

সমতা বিশ্বাস
সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

অধ্যক্ষা প্রফেসর ড. মমতা চৌধুরী রায়, বেথুন মহাবিদ্যালয় কর্তৃক
১৮১, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬ হইতে প্রকাশিত

মুদ্রক

শৈলী প্রেস প্রাঃ লিঃ

৪এ মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৫৪

saileepress@yahoo.com

নিবেদিতা ও ভারতীয় শিল্প

জহর সরকার

জন্মের সার্ধশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে নিবেদিতার মতন একজন মহামানবীকে নিয়ে অজস্র সুকথিত শব্দ প্রবাহ তৈরি হবে, এইটেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আমাদের কাছে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাঁর জীবন আর অবদানের এমন অনেক অদেখা অংশ যে দিকে তাঁর সমসময়ে এবং আমাদের সমকালেও তেমন একটা নজর পড়েনি। মার্গারেট নোবেল, যাঁকে আমরা সবাই ভগিনী নিবেদিতা নামে চিনি, তাঁর জন্মের সার্ধশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনেও এই চেনা পথের রেখা দেখা দিচ্ছে। তেমনি ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের প্রতি তাঁর অপরিসীম আত্মত্যাগের অনেক অনালোচিত ক্ষেত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সুদূর আয়ার্ল্যান্ড এবং ব্রিটিশ ভূখণ্ডের এই আশ্চর্য মহিয়সী তাঁর নিজস্ব দেশ ছেড়ে এসে ভারতকেই গ্রহণ করেছিলেন আত্মভূমি বলে। ভালোবেসেছিলেন আপ্রাণ। উদ্যমী, উৎসাহী এবং তাঁর মতন কর্মতৎপর মানুষকে একটি বিশেষ বিন্দুতে থামিয়ে তাঁর বহুমুখী অবদান একই সঙ্গে বুঝতে চাওয়া খুব কঠিন।এই নিবন্ধে আমি মূলত ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টা সাধারণের অজানা এবং তাঁর চিরন্তন অবদান নিয়ে আলোচনায় খানিকটা কোণঠাসা। বিষয়টি আলোচনার জন্য আমি তাঁর *মডার্ন রিভিউ*-তে প্রকাশিত মূল প্রবন্ধগুলির সাহায্য নিয়েছি। সেগুলি পরবর্তীকালে অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত *Complete works of Sister Nivedita* (CWSN)-র তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত। আমি তাঁর নিজের লেখা বইগুলি, যেমন *Footfalls of Indian History,* যেখানে 'The ancient abbey Ajanta' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। দুটি একেবারে সাম্প্রতিক প্রকাশনা, প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণার *Sister Nivedita and the Indian Art Movement*, এবং রেবা সোমের *Margot : Sister Nivedita of Vivekananda* আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। আমি এছাড়াও শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র নিবেদিতা লোকমাতা, NBT-র *Women Pioneers : The Indian Renaissance*, ই. বি. হ্যাভেলের *Indian Sculpture and Painting* (১৯০৮),আর শিবকুমার-এর *Paintings of Abanindranath Tagore* এবং আরো অন্য কিছু প্রবন্ধ ও বইয়ের সাহায্য নিয়েছি।

শিল্পক্ষেত্রে নিবেদিতার কাজ নিয়ে কথা বলবার আগে তাঁর সার্বিক অবদান নিয়ে সামান্য দু-এক কথা বলে নেওয়া ভাল। তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দেখেছিলেন। স্বামীজীর বাণী ও কাজ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু, ১৮৯৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাতেই নিবেদিতা বুঝতে পারেন তিনি এই মহান মানুষটির পথ ধরে হতোদ্যম, অবদমিত ভারতবর্ষের উদ্ধারের কাজে ব্রতী হতে চান। যাতে ভারত আবার বিশ্বের দরবারে তার নিজের স্থান খুঁজে পায়। প্রাথমিক কতগুলি দ্বিধা কাটিয়ে স্বামীজী রাজি হন, এবং ১৮৯৭ সালে নিবেদিতা কলকাতার জাহাজ ধরেন। তিনি স্বামীজীর প্রধান বিদেশী শিষ্যা, একজন একনিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গিনী হিন্দু হিসেবে সুবিখ্যাত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি এবং তাঁর আত্মজনদের ত্যাগ করে তিনি ভারতবর্ষের জন্য জীবনপাত করেছেন। স্বামীজীর ফেলে যাওয়া রশি তিনি তুলে নেন, এবং তাঁর সবথেকে বড় অবদান হল

ভারতীয় জনগণকে তাদের ঘুমন্ত দশা থেকে জাগিয়ে তোলা — নতুন জাতি হিসেবে জাগিয়ে তোলা, যাদের নিজেদের ঐতিহ্য আর সভ্যতা নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত। তিনি বিবেকানন্দের হাতে গড়া শিষ্যা বলেই জীবনে কখনো তাঁর গুরুর স্বপ্নগুলি ছেড়ে যাননি, কিন্তু নির্ভীকভাবে, ব্রিটিশরা যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁদের সাহায্য করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছেন। ভারতীয় মহিলা ও কিশোরীদের উন্নতির জন্য তিনি যে স্কুল করেছিলেন, তা আজ সুবিখ্যাত। তিনি শক্তিশালী লেখক এবং সুস্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল পাশ্চাত্যে ভারতবর্ষ যে কোন বিভীষিকা নয়, তা বুঝিয়ে বলা তাঁর কর্তব্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন, এবং একই সঙ্গে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানেরও অন্যতম প্রচারক। তাঁর যেই দিকটি কম আলোচিত তা হল, তিনি ভারতীয় শিল্পের খুব বড় সমর্থক ছিলেন।

প্রাচীন ভারতের চারুকলার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় হস্তশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ দুটিই নিখাদ এবং গভীর। কারণ এই দুই শিল্পের দুটি আলাদা ক্ষেত্র ছিল। রেবা সোম বলেছেন 'যখন নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসেন, তিনি স্থানীয় হস্তশিল্প এবং কুটীরশিল্পের বিপুল বিস্তার দেখে আশ্চর্য হয়ে যান।' যুগ যুগ বাহিত শিল্পী পরিবারগুলির ধারাবাহিকতা তখন যন্ত্রসভ্যতার যুগে সংকটের সামনে এসে পড়েছিল। তিনি এক্ষেত্রেও বিবেকানন্দকে গুরু রূপে পেয়েছিলেন, যিনি তাঁকে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের উত্তরাধিকার বুঝিয়ে বলেন। তাঁর কাছে এই উপদেশ অমূল্য। নিবেদিতা ভারতবর্ষের দরিদ্র কিন্তু সুদক্ষ হস্তশিল্পীদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন। তাঁরাই বহুযুগ বাহিত চিরকালীন ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের প্রকৃত উপস্থাপক, হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে আসা শিল্পকুশলতার ধারক ও বাহক। এই ধারাবাহিকতার বিপরীতে এই দেশের চারুকলা, যেমন চিত্রকলা, ভিত্তিচিত্র, খোদাই শিল্প, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য অনেকগুলি ভাঙনের মধ্যে দিয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে এই অন্ধকার সময় এত ধ্বংসাত্মক যে ভারত তথা বিশ্ব ভুলেই গেল ভারতবর্ষের এই সুউচ্চ শৈল্পিক উৎকর্ষ। ব্রিটিশ শাসকরা ঠিক এইখানেই ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষকে নন্দনতাত্ত্বিকভাবে অনগ্রসর জাতি হিসেবে সমালোচনা করেছিলেন। ভারতবর্ষীয়দের নিশ্চয়ই কিছুটা দোষ দেওয়া যায়। গুপ্তযুগ পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গুহায় স্তূপ এবং চৈত্যের গড়ে ওঠা পূর্বতন বৌদ্ধযুগীয় শিল্পের অসামান্যতা এবং অগ্রসরণ অনেকটাই ধ্বংস হয়ে যায়। এই ধ্বংস্তূপগুলো এতটাই অবহেলায় পড়েছিল যে 'অভাবনীয় ভারত'-এর স্মৃতিটুকুও হারিয়ে গেছিল। সুতরাং নিবেদিতার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল এই বিস্মৃতিকে চুরমার করে দেওয়া এবং ভারতের অতীত আত্মগৌরবকে পুনঃস্থাপন করা। তাছাড়া কোন জাতীয় সত্ত্বা পুনরাবিষ্কার অসম্ভব। নিবেদিতার কাছে ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রসারেরই এক সম্প্রসারিত আবেগ। তিনি লিখছেন, 'I ... think that our greatest work in modernising India might be done through art, instead of through the press or the universities. It is art as of ... the national sense that we need.'[2]

নিবেদিতা অথবা মার্গারেট নোবেলের শিল্পকলা বিষয়ে কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। কিন্তু তিনি বহুদিনের চর্চায় এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা গড়ে তুলেছিলেন। কখনো কখনো এই দক্ষতা জটিল আকার ধারণ করলেও পরবর্তী কালে তা তাঁকে অগ্রগণ্য শিল্প সমালোচকের প্রতিষ্ঠা দেয়। তিনি নিজে চিত্রশিল্পী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চোখে শিল্পদৃষ্টি ছিল। এমন এক সময়ে নিবেদিতা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে ভারতীয় শিল্পের প্রচার করতে শুরু করেন, যখন তা অসম্ভব কঠিন কাজ ছিল। এইভাবে তিনি ভারতীয় শিল্পের একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার জন্ম দিতে সাহায্য করেছিলেন। এই নিয়ে আমরা

বিস্তারিত আলোচনা করব। মার্গারেটের শিল্পকলা বিষয়ক আগ্রহের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯২ সালে, যখন তাঁর ২৫ বছর বয়স, এবং তার মধ্যেই একটি বিদ্যালয়ের প্রধান এবং শিক্ষিকা হিসেবে যথেষ্ট পরিচিত। লন্ডনের উইম্বলডনে তিনি তাঁর নিজের স্কুল স্থাপন করেন সেই বছরেই। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও বন্ধু এবেনজার কুককে নিয়োগপত্র দেন কলাবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে। তাঁর কাছ থেকেই মার্গারেট ১৮৯৫ পর্যন্ত ৩ বছর শিল্পকলা বিষয়ক অনেক খুঁটিনাটি শিখে নেন। ঐ একই বছরে লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা তাঁর জগৎ-দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়। তিনি স্বামীজীকে অনুসরণ করে ভারতে আসেন ১৮৯৭-৯৮ সালে এবং স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দীক্ষা দেন। উইম্বলডনে তাঁর শিল্পকলার সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় তাঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, এবং শিল্পপ্রেমী ভারতীয়দের জীবনেও তা একইরকম ভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য শিল্পের সুদূরপ্রসারী প্রভাব থেকে তিনি তাদের বার করে আনতে পেরেছিলেন কারণ তিনি বিষয়টা বুঝতেন, এবং ভারতীয় চিত্রশিল্প, ভিত্তিশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ব সৌন্দর্য ও গরিমায় মুগ্ধ হতে পারতেন।

১৮৯৮-এর জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষে এসে মার্গারেট, সিস্টার নিবেদিতার নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্যা এবং প্রচার সহযোগিনী হয়ে তিনি কোনোরকম অভাব অভিযোগ ছাড়াই সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলেন। ভারতবর্ষে অসহ্য গরম, অসুখ বিসুখ, আবর্জনা এবং অবিশ্বাস্য দারিদ্র, কঠিন জীবনযাত্রা সত্ত্বেও এতে কোন সন্দেহই নেই যে নিজের দেশ থেকে বহুদূরবর্তী এই ভারতবর্ষকে তিনি অন্তর থেকে ভালোবেসেছিলেন। তিনি সমাজসেবায় প্রথম থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যখন কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল, তিনি এই মহামারীর সঙ্গে একেবারে সামনে থেকে লড়াই করেছিলেন। তিনি নিজে রাস্তাঘাট ঝাঁট দিয়েছিলেন এবং ব্যাপারটা কলকাতাবাসীর চোখ খুলে দিয়েছিল। তারাও আস্তে আস্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রচার কাজে যুক্ত হয়ে পড়ল, যদিও আবর্জনার সংস্পর্শ তাদের ধর্মীয় আচারে অশুচি। এমন কি রামকৃষ্ণ মিশনের সদ্য-সন্ন্যাসীরাও তাঁদের কৃচ্ছসাধনা ও পুঁথিপাঠ ছেড়ে রাস্তায় সাধারণ মানুষের সাহায্যে নেমে আসেন। নিবেদিতার এই প্রনোদনার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েছিল মিশনের এবং সন্ন্যাসীদের ওপর, যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের মূল কাজ আশ্রমে প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ — জীবনের উত্থান পতনে তাঁদের কোন ভূমিকাই নেই। যারা সাহায্যের জন্য কাঁদছে, সেই মানুষগুলোর সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করার কথা তাঁরা তখনও ভাবেননি। এই ভাবেই তাঁর ৪৪ বছরের জীবনে, তিনি পরবর্তী ১৪ বছরে এক ঝড়ের মত বয়ে গিয়েছিলেন।

১৯০২ সালে স্বামীজীর তিরোধানের পরে নিবেদিতা ক্রমশঃ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সরে আসেন এবং নিজের সামাজিক কাজকর্মে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তারই অংশ। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি, এদেশের নারী এই সবকিছু নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে এই মহৎ প্রাচীন সভ্যতা কেমন করে অবদমিত হচ্ছে আর ধ্বংসের পথে চলেছে, সেই কথা পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরতে আনুষঙ্গিক সবকিছুই তাঁর চিন্তাভাবনার বস্তু হয়ে উঠল। এই বয়ানে ভারতীয় জাতি এবং তার স্বাধীনতা স্থান পেল সবার ওপরে। তখন অধিকাংশ ভারতবাসীর পক্ষেই সাম্রাজ্যের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারার কথা ভাবা কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি এই সভ্যতার প্রত্যেকটি সম্ভাব্য দিক তুলে ধরলেন এবং প্রথমত ভারতীয়দের সামনেই তাদের উজ্জ্বল করে তুললেন, যাতে তারা তাদের ভুলে যাওয়া অতীত এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হতে পারে। ১৯০৬ সাল থেকে তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প নিয়ে নিবেদিতার অজস্র লেখালেখির সম্ভার আমাদের হাতে এসেছে। বস্তুতঃ ভারতীয় শিল্পে তাঁর মূল উৎসাহ পাশ্চাত্য সভ্যতার, বিশেষত, গ্রীক শিল্প চিন্তার অবদান নয়। হেলেনিক শিল্পচিন্তার কাছে ভারতবর্ষ

সর্বৈব — ঋণী এই প্রভাবশালী মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গিয়ে বিবেকানন্দ ১৯০২ সালের প্যারি কনফারেন্সে একটি অসাধারণ বক্তৃতা দেন। নিবেদিতার ভাবনা চিন্তায় এই বক্তৃতার সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে।

কলকাতার সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ের (গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট) প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎও তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। একাধারে শিল্প ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পসমালোচক হ্যাভেল-ই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশৈলী পুনরুত্থানের পথিকৃৎ। স্বামীজী যা অনুভব করেছিলেন এবং নিবেদিতা যা আন্দাজ করেছিলেন — ভারতীয় শিল্পকলা ইউরোপীয় শিল্পের বহু পূর্ববর্তী এবং গ্রিক ঐতিহ্যের স্পর্শ ব্যতিরেকেই স্বাধীন ভাবে গড়ে উঠছিল, হ্যাভেল এই মতকেই হাতে নাতে প্রমাণ করে দেখান। নিবেদিতা হ্যাভেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন এবং বলেছিলেন, '[তিনি] ঠিকই অনুমান করেছেন, ভারতীয় শিল্পকলা ভারতীয় আদর্শেই বুঝতে হবে'। হ্যাভেলের বই *Indian Sculpture and Painting* থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

> গ্রিকরা যেমন ভারতের দর্শন ও ধর্ম তৈরি করেননি, ঠিক তেমনই তাঁরা ভারতীয় শিল্পও তৈরি করেননি। গ্রিক নন্দনতত্ত্বের আদর্শ ভারতীয় চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং তা কখনোই ভারতীয় চারুশিল্পের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এই শিল্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব চরিত্র গুণে সম্পূর্ণত ভারতীয় চিন্তা এবং ভারতীয় শৈল্পিক ঔৎকর্ষের ফল।[3]

সাধারণভাবে বেশীরভাগ লোক যা জানত তার বিরুদ্ধে গিয়ে এই মতবাদ প্রচার করাই আগামী দশ বছরে তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। ভারতের নিজস্ব শিল্প ঐতিহ্যের গড়ে ওঠায় নিবেদিতার অবদানে আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাঁর অদম্য উদ্যম এবং ঐকান্তিক সমর্থনেই হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই শিল্পশৈলী (বেঙ্গল স্কুল), শুধুমাত্র শিল্পীমহলের বাইরে বেরিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় জাতীয় জাগরণের অবশ্যম্ভাবী এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলাকে সংযুক্ত করে নেওয়ায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ই. বি. হ্যাভেল এবং অবন ঠাকুর ভারতীয় কলাবিদ্যার শিক্ষাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট। তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিল্পতত্ত্বের বিরুদ্ধে মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিবেদিতা সাধারণ ভারতবাসীর নিজস্ব শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গী পুনর্গঠন করেছিলেন। নিবেদিতার সাথে হ্যাভেলের প্রথম দেখা হয় ১৯০২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে, অর্থাৎ স্বামীজীর তিরোধানের কয়েক মাস আগে। হ্যাভেলের শিল্পচিন্তার সঙ্গে তাঁর নিজের ভারতীয় শিল্পদৃষ্টির মিল দেখে নিবেদিতা খুশী হয়ে ওঠেন। হ্যাভেলের প্রথম দিকের কাজ, যেমন *Taj and Its Environs* (১৯০৩) এবং *Benares* (১৯০৫) থেকেই জানা যায়, ভারতীয় শিল্পের শিকড় ভারতবর্ষেই গভীর ভাবে প্রোথিত এবং বহির্ভারত থেকে ধার করা নয়। কিন্তু তাঁর পরের দিকের রচনা, যেমন *Essays on Indian Art, Industry and Education* (১৯০৮) এবং তাঁর মহৎ কাজ, *Indian Sculpture and Painting* (১৯০৮) — এই দুটি গ্রন্থেই প্রধানত হ্যাভেল সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদী মনস্তত্ত্ব ছেড়ে সাহসী পদক্ষেপ নিলেন।

নিবেদিতা এছাড়াও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সদ্য যুবা আনন্দ কুমারস্বামীর চিন্তাভাবনায় এবং তাঁকেও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। কুমারস্বামী পরবর্তী কালে ভারতীয় শিল্পের আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে অন্যতম প্রধান হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিল্প গবেষক জন উডফ্রে এবং লর্ড কিচেনারের মতন সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতায় নিবেদিতা হ্যাভেল এবং কুমারস্বামীর সঙ্গে যোগদান করেন। ভারতীয়

শিল্পবিষয়ক জ্ঞানেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকলে এই বিখ্যাত গবেষকদের চিন্তা ভুল বলে প্রমাণ করা যেত না। জানতে হত ইতিহাস এবং ভারতীয় সভ্যতার অজস্র তথ্য। শিল্প বিতর্ক শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অথবা বিসম্বাদী তরজা নয়। আরেকজন শিল্পব্যক্তিত্ব যাঁকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — যিনি শুধু নামকরা শিল্পীই ছিলেন না, পাশ্চাত্য আঙ্গিকেও পারদর্শী ছিলেন। কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং নিবেদিতা তাঁকে ভারতীয় শিল্পকলায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতেন। বেঙ্গল স্কুল হিসেবে পরিচিত ভারতীয় শিল্প আঙ্গিকের সর্বপ্রথম বড় শিল্পী হিসেবে অবনীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ এই প্রনোদনারই ফল। তাঁর এই পরিবর্তনে নিবেদিতার ভূমিকার কথা তিনি সকৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করেছেন, এবং তার 'ভারতমাতা শিল্প' ঔৎকর্ষের এক চরম নিদর্শন হয়ে আছে। *Modern Review* পত্রিকায় নিবেদিতা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লেখেন :

> স্বাজাত্য ভাবনার শিল্পী কি করে একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে, কোন বিমূর্ত চিন্তা রক্তমাংসের আকার নিয়ে চিত্রিত হতে পারে কি? নিঃসন্দেহে তা সম্ভব। বস্তুতঃপক্ষে আমাদের মনে যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব ভারতমাতা ছবিটি সেই সম্ভাবনার সাক্ষাৎ নিদর্শন।

এইভাবেই কিছু কিছু ভারতীয় শিল্পী শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য তেল রঙ আর ক্যানভাস অথবা বোর্ড পরিত্যাগ করলেন। শুধুমাত্র অনুভূতির তীক্ষ্নতা এবং সূক্ষ্মতার উপর নির্ভর না করে জোর দিলেন ভারতীয় অনুভবন ও ভাবের ওপরে। অবশ্য রবি বর্মার মতন শিল্পীরাও ছিলেন, যাঁরা ভারতীয় পুরান নির্ভর ছবি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য কৌশল এবং শিল্প আদর্শে আঁকতেন।

জাপানী বিপ্লবী এবং চিন্তাবিদ ওকাকুরার সঙ্গেও নিবেদিতার বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের মতো নিবেদিতাও প্রাচ্য শিল্পের সেই সব উপাদান নিয়ে মুগ্ধ ছিলেন যাতে পাশ্চাত্যের লেশমাত্র ছোঁয়া নেই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁরা এই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে আলোচনা করতেন, সঙ্গে থাকতেন তাইকেন এবং হিশিদার মত জাপানী শিল্প বিশেষজ্ঞরাও। ইউরোপীয়ান শিল্পবিশারদরাও একই রকম সমাদর পেতেন। সত্যি কথা বলতে ভারতীয় শিল্পীদের জাপানী শিল্প বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যুক্ত করে, দূর-প্রাচ্য এবং ভারতবর্ষের নতুন সংযোগসূত্র ও ভাবনা বিনিময়ে নিবেদিতাই সাহায্য করেন। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এবং অসিতকুমার হালদারের মত তরুণ শিল্পীদের ওপর তাঁর অনেকখানি প্রভাব ছিল। এঁরা প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল স্কুলকে সমৃদ্ধ করে তোলেন এবং গোটা বিশ্বে বিখ্যাত করেন। উদাহরণ নন্দলাল তাঁর *মহাশ্বেতা* ছবিটিতে রবি বর্মার পাশ্চাত্য প্রকরণ অনেকটাই নকল করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার প্রভাবে এসে তিনি অবনীন্দ্রনাথের *'বুদ্ধ এবং সুজাতা'* ছবির অন্তর্লীন সৌন্দর্যের সন্ধান পান, এবং তাঁর শিল্পশৈলী চিরদিনের মত পালটে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, ভারতীয় শিল্প নিজের গুণেই সমৃদ্ধ। নিবেদিতা তাঁর "The Function of Art in Shaping Nationality" (১৯০৩) প্রবন্ধে লেখেন :

> একটি ভারতীয় চিত্র, সত্যই যদি তা ভারতীয় হয় এবং মহৎ হয়, তা ভারতীয় মনকে ভারতীয় পথেই স্পর্শ করবে। কোন না কোন আদর্শে, কোন ভাব অথবা অনুভব, হয় পরিচিত, অথবা তৎক্ষণাৎ অনুভববেদ্য।

অজন্তা গুহাচিত্রের অনন্য চরিত্র যাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন এবং পৃথিবীর কাছে প্রথম তুলে ধরেছিলেন, নিবেদিতা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় শিল্পের এই অবর্ণনীয় বিস্ময় ১৮১৯ সালে একজন ব্রিটিশ সৈন্য আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। প্রায় ৪০০ বছর বা তারও বেশি সময় এই শিল্পের কোন হদিশ ছিল না।

ভূতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ, স্থপতি, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকদের অজন্তার গল্পটি বুঝতে এবং গড়ে তুলতে অনেক সময় লেগেছিল। ভারতীয় ইতিহাসের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত হতে লেগেছিল আরো বেশি সময় এবং এইখানে নিবেদিতার অবদান খুব বেশি মানুষ জানেন না। আবিষ্কারের ২৭ বছর পর, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি মেজর রবার্ট গিল নামের একজন পেশাদার শিল্পীকে নিয়োগ করেন এই গুহার বহুবর্ণ দেয়ালচিত্রগুলি নকল করতে। গিল ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর ধরে ২৭টি বিশাল ছবি আঁকেন, কিন্তু সেইসব ছবি ১৮৬৬ সালে লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেসের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভাঙা মন নিয়ে গিল ১৮৭৫-এ অজন্তায় আবার ফিরে যান। দ্বিতীয় দফার কাজ বেশি দূর এগোতে না এগোতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে, প্রাথমিক ছবি তোলার সাজসরঞ্জাম নিয়ে গিল সাদাকালো কিছু ছবি তুলেছিলেন। তৎকালীন বিদ্বজ্জনদের কাছে সেই ছবি পৌঁছে যায়। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৮৪৮ সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি বম্বে বোর্ড টেম্পল কমিশন প্রতিষ্ঠা করে — যার কাজ ছিল বম্বে প্রেসিডেন্সীতে গুহাগুলি পরিষ্কার করা এবং তাদের বিশেষত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণ করা।

১৮৭২ সালে বম্বে প্রেসিডেন্সী জন গ্রিফিথ আর তাঁর ছাত্রদের আবার একই কাজে নিযুক্ত করেন। ১৩ বছরের পরিশ্রমে এই দল ৩০০টি ক্যানভাস তৈরিতে সমর্থ হয়। এদের অনেকগুলি লন্ডনের ইমপিরিয়াল ইন্সটিটিউটে (যা পূর্বতন ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়াম) প্রদর্শিত হয় ১৮৮৫ সালে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আরেকটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় শতাধিক ছবি নষ্ট হয়ে যায়। এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ১৬৬টি ছবিই বর্তমানে অজন্তা গুহাচিত্রের প্রাচীনতম পুনর্স্থাপনের নিদর্শন, যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি আবহাওয়া, চুঁয়ে পড়া জল, মানুষের অবহেলা এবং ভুলে ভরা সংরক্ষণে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে অজন্তা গুহাচিত্রগুলি কেমন দেখতে ছিল। তাছাড়া গ্রিফিথ আর তাঁর দলবলের ব্যবহার করা সস্তার বার্নিশও মূল ছবিগুলির ক্ষয়ক্ষতির জন্য কিছুটা দায়ী। এই সম্পদ জনসাধারণের জন্য প্রদর্শিত হয়নি এবং ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকাজে এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাবও পড়েনি। এর জন্য আমাদের চলে যেতে হবে পরবর্তী পর্যায়ে যখন লেডি ক্রিস্টিনা হেরিংহাম, নিবেদিতার সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯০৯ থেকে ১৯১১র মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। নিবেদিতা নন্দলাল বসু এবং অসিতকুমার হালদারকে হেরিংহামের সঙ্গে সহযোগী হিসাবে পাঠালেন। তাঁরা যা দেখলেন এবং প্রতিরূপ আঁকলেন, তা তাঁদের গভীরভাবে প্রভাবিতই শুধু করল না, বরং এই পুনরুৎপাদনেই প্রথম ভারতীয় ভাবধারার ছাপ স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ল। ভারতীয় শিল্পধারায় এটি একটি মোড়বদলের মুহূর্ত। অজন্তা গুহাচিত্র অথবা সেই আদলের আঁকা ছবি বৃহত্তর জনপরিসরে পৌঁছে গেল। ঠিক এইখানেই নিবেদিতা এবং হেরিংহাম সম্পূর্ণ আলাদা একটি স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতীয় শিল্পের ফল্গুধারা অজন্তা আর আধুনিক ভারতশিল্পের সংযোগ সাধনে।

নন্দলাল ভারতীয় শিল্পের ভারতীয়ত্বের প্রতি তাঁকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে নিবেদিতার কাছে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলেছেন :

> ভারতীয় শিল্পীর অগ্রগতির চিন্তা তাঁর মনে সর্বদাই খেলা করে যেত। তাঁর কাছ থেকে আমি যে উৎসাহ পেয়েছি তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর তিরোধান অনেকটাই পথের দিশারী হারিয়ে ফেলার মতন বেদনাদায়ক।

শুধুমাত্র নন্দলাল একাই নিবেদিতার উৎসাহ পেয়েছিলেন, তা নয়। সমস্ত তরুণ শিল্পী, যাঁরা অজন্তা অথবা মুঘল অথবা রাজপুতানার ভারতীয় আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরও জুটেছিল সমান সমর্থন। অসিত

হালদার, সুখলতা রাও এবং সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এঁরাও ছিলেন তাঁর প্রিয় শিল্পী। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল ভারতীয় শিল্পীর প্রতিভা ব্রিটিশদের পদভারে এতদূর চাপা পড়ে গেছে যে একটি নবশক্তির বিস্ফোট প্রয়োজন। তিনি তাঁদের জাগিয়ে তুললেন, সাহায্য করলেন, পথের দিশা দেখালেন। প্রয়োজনে ভর্ৎসনাও করলেন। তাঁদের প্রদর্শনী দেখলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *Modern Review* এবং *'প্রবাসী'* পত্রিকায় তাঁদের ছবি প্রকাশ করে এবং উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা লিখে তাঁদের উজ্জীবিত করে তুললেন। এইরকমই ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। তিনি পাশ্চাত্য শিল্পে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতীয় শিল্প পাশ্চাত্য শিল্পের কোন অনুকরণ নয়। তাদের নিজস্ব উজ্জ্বল ইতিহাস আছে। দা ভিঞ্চি, রাফায়েল, জে. এফ. মিলেট, প্যাভিস দ্য চ্যাভেনেস এবং অন্যান্য সমসাময়িক পাশ্চাত্য শিল্পীদের সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখতেন। এমনকি অরবিন্দ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পের গুণমুগ্ধ ছিলেন, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত নিবেদিতার ক্রমাগত প্ররোচনায় ভারতীয় শিল্পের সমঝদার ও অন্যতম সমর্থকে পরিণত হন। নিবেদিতা জোর গলায় বলেছেন :

> ভারতীয় জনগণ ভারতীয় শিল্পের ধারণায় শিক্ষিত, এবং ভারতীয় অনুভূতিসূত্রে নির্মিত। এবং তাঁদের কাছে শিল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ইটালী এবং গ্রিসের ক্রমাগত উল্লেখ শুধু অর্থহীনই নয়, ভাবনারও অতীত।

বহু শিল্পীর মধ্যে নানারকম সৃজনপ্রতিভায় তাঁর মন গর্বে ভরে উঠেছিল, মৃত্যুর ঠিক একবছর আগে দেখা শেষ চিত্রপ্রদর্শনীটিতে। সেটা ছিল ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার ছাড়াও সেখানে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ভেঙ্কটাপ্পা, ও. সি. গাঙ্গুলী এবং ঈশ্বরীপ্রসাদের মত শিল্পীরা। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা একরাশ আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম, কারণ একটি নতুন শৈলীর অভিযাত্রা ও প্রাচীনের সাথে তার সংযোগ এত পরিষ্কার ভাবে কখনো বোঝা যায়নি'। আমরা অনেকেই এই বিষয়ে প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণার মতামত সমর্থন করব। তিনি লিখছেন, 'এ কোন অতিরঞ্জন নয় যে বেঙ্গল স্কুলের জন্ম এবং প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে তাঁর নাম চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে'।

তথ্যসূত্র

1) Reba Som, *Margot : Sister Nivedita of Vivekananda*, Viking, 2017

2) *Nivedita's letters* 26th January 1905, vol. 2, pp 714-15

3) CWSN (pg 22)